কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট

৩৫

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' বৈশ্বিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-এর জুনে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিক-ভাবে যাত্রা করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায়, এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে এবং উন্নয়নের সুফল যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১২০টির অধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোভিড অতিমারির দুর্যোগপূর্ণ সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অথচ এ উন্নয়নের সুফল সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা খুবই সীমিত। যাদের উদ্দেশ করে এসব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হচ্ছে, স্থানীয় পর্যায়ে থেকে এ বিষয়গুলোকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করছেন, তা সঠিকভাবে জানা অত্যন্ত জরুরি। বিভিন্ন খাতের কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেগুলো আসলে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, এই উন্নয়নের সুফল সবাই সমানভাবে পেল কিনা, অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে কিনা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করাও এ সভার অন্যতম উদ্দেশ্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম স্থানীয় সমাজের এসব ব্যক্তিকে নিয়ে ২০২২ সালের ২ অক্টোবর চট্টগ্রামে একটি নাগরিক পরামর্শ সভার আয়োজন করে। সভায় চট্টগ্রামের সুশীল সমাজ, নাগরিক প্রতিনিধি, অ্যাকাডেমিয়াসহ সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে মোট ৩০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করেন।

নাগরিক পরামর্শ সভা: চট্টগ্রাম

এসডিজি বাস্তবায়নে প্রয়োজন সঠিক প্রস্তুতি, হোমওয়ার্ক ও দূরদর্শী পরিকল্পনা

সূচনা বক্তব্য

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সভার সূচনালগ্নে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, গত দেড় দশকে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। গত ১২ বছরে মানুষের মাথাপিছু গড় আয়ু পাঁচ বছর বেড়েছে। বর্তমানে গড় আয়ু ৭২ বছর। এ সময়ে নারী ও শিশু মৃত্যুহার অনেক কমেছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও রয়েছে। সুতরাং এসব সাফল্য কেবল সরকারের একার নয়, এখানে সবার ভূমিকা আছে। তবে সকলেই মনে করেন, অর্জিত সাফল্য সত্ত্বেও এ সময়ে সমাজে অনেক বেশি বৈষম্য দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে মানুষের আয়-রোজগার, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে এ বৈষম্য দৃশ্যমান। এখন সবার দেখার বিষয় হলো বিগত বছরগুলোয় যে উন্নয়ন হয়েছে, তা থেকে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কতটা সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অভিগম্যতার পরিস্থিতি কেমন—সেটি অনুধাবন করা প্রয়োজন। নতুন কোনো সরকারি স্থাপনা হলো কি না, কোভিডকে কেন্দ্র করে সরকার যেসব প্রণোদনা সুবিধা ঘোষণা করেছে, সেগুলোর সুবিধা উপযুক্ত ব্যক্তিরা সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা এসব বিভিন্ন বিষয়ে ড. দেবপ্রিয় সবার মতামত জানতে চান। তিনি বলেন যে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছে। এসডিজি সরকারের স্বীকৃত একটি আন্তর্জাতিক বিষয়। আর এটি বাস্তবায়নের জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট দলিলে সই করে এসেছেন। আমাদের সবার উচিত এটি বাস্তবায়নে তৎপর হওয়া। এসডিজির ১৬তম অভীষ্টে নাগরিক অধিকারের কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এ বিষয়টি বারবার ঘুরে ঘুরে চলে আসে।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে উন্নয়ন হয়েছে সত্যি, কিন্তু সে উন্নয়নের সুবাতাস সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছেনি। বর্তমানে সমাজে যে বৈষম্য বিরাজ করছে, আজ থেকে ৪০ বছর আগে বৈষম্যের প্রকৃতি এমন ছিল না। বৈষম্য যে সমাজে একেবারে থাকবে না, তা নয়; কিন্তু এখন যে ধরনের বৈষম্য চলছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। পুরোনো একটি ধারণা ছিল বৈষম্য উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি। বৈষম্য হচ্ছে মানেই উন্নয়ন হচ্ছে বলে আগে একটি ধ্যান-ধারণা ছিল। তবে বর্তমান সময়ে এ ধারণা বদল হয়ে গেছে। উন্নয়নের প্রথম স্তরে বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী বলে সরকার যে ধারণা প্রচার করে, তা ঠিক নয়। আর বৈষম্য হ্রাস করার জন্য সরকার যেসব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে, বিতরণ ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে সেগুলো বৈষম্য কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। এগুলো কার্যকর না হওয়ার পেছনে মূল কারণ হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব। মূলত গণতন্ত্র চর্চার ঘাটতিজনিত কারণেই জবাবদিহিতার অভাব দেখা যাচ্ছে।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সঠিক হিসাব নিরূপণ হচ্ছে না

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি হিসেবে এক বক্তা উল্লেখ করেন, সরকার প্রতিবন্ধীদের ভাতা দিচ্ছে। এটি একদিকে যেমন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে সমস্যারও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার বর্তমানে ২৩ লাখ প্রতিবন্ধীকে ভাতা দিচ্ছে। কিন্তু দেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আরও অনেক বেশি। আর জনশুমারির তথ্যে প্রতিবন্ধীর যে হিসাব প্রকাশ করা হচ্ছে, তা সঠিক নয়। কারণ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর হার মোট জনগোষ্ঠীর ২০ শতাংশের বেশি হওয়ার কথা। আমাদের দেশে ১০ শতাংশের একটি অনুমিত হিসাব নানা সময়ে উল্লেখ করা হলেও জনশুমারিতে তা দুই শতাংশেরও নিচে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে বছরের শুরুতে সরকারের তরফ থেকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী বই তুলে দেওয়া হচ্ছে; বিশেষ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হাতে ব্রেইল-সহায়ক বইপত্র তুলে দেয়া হচ্ছে। এটি ভালো উদ্যোগ। তবে এর আবর্তন (কাভারেজ) আরও বাড়াতে হবে। আর ডিজঅ্যাবিলিটির নানা রূপ থাকলেও আমাদের দেশে একমাত্র অটিজমকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। অন্যান্য ডিজঅ্যাবিলিটিরও স্বীকৃতি প্রয়োজন। সরকারি চাকরির পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, বিশেষ করে শ্রুতি লেখক নিয়োগের ক্ষেত্রে। সে কারণে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে।

দারিদ্র্য ও নিরাপত্তাহীনতাজনিত কারণে বাড়ছে বাল্যবিয়ে

চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাল্যবিয়ে কমেনি, বরং করোনাকালে আরও বেড়ে গেছে। বিশেষ করে লকডাউনের সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার সময়ে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেও বাল্যবিয়ে বেড়ে গেছে। এক্ষেত্রে বাল্যবিয়ে রোধে আইনি শিথিলতা অনেকখানি দায়ী। এ সুযোগের অপব্যবহার হয়েছে। আইনে ক্ষেত্রবিশেষে ১৮ বছরের নিচের বয়সী মেয়েদেরও বিয়ে দেওয়ার বিধান যুক্ত রয়েছে। এটি যুক্তিযুক্ত নয়। আর বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি বিষয় বড় ভূমিকা রাখছে। এগুলো হলো— আর্থিক অসংগতি, কন্যাশিশুর নিরাপত্তাজনিত ঘাটতি ও ধর্মীয় বিষয়াদির প্রভাব। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের ধর্মভীরু মানুষ মনে করে, ছেলেমেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়া সবদিক থেকে ভাল। আর অপেক্ষাকৃত অগ্রসর পরিবারের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের শিক্ষাদীক্ষায় বেশি জোর দেওয়া হয়।

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, নদীভাঙনও বাল্যবিয়ের অন্যতম কারণ। নদীভাঙনের ফলে বাস্তুহারা অনেক মানুষ সরকারি বিভিন্ন খাস জমি ও বেড়িবাঁধের মতো স্থানে অবস্থান করে। তারা মেয়েদের নিরাপত্তাজনিত কারণে কম বয়সে তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়। বাবা-মায়ের একটি সাধারণ চিন্তা থাকে- 'মেয়ে তো শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। সুতরাং তার লেখাপড়া একটা পর্যায় পর্যন্ত হলেই চলে।' মূলত তাদের আগেভাগে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার চিন্তা থেকে এমন করা হয়। তবে বিষয়টি পরিবার ও সামাজিক অবস্থানভেদে ভিন্ন হতে পারে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে এখন নারীদের নিরাপত্তার অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। পাশাপাশি নানা ধরনের গোঁড়ামি আরও বেশি পরিমাণে সমাজে জেঁকে বসছে। এসব বিষয় মেয়েদের বাল্যবিয়ে বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ। রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন পদে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপের প্রস্তাব দেন এক বক্তা। পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর তাগিদ দেওয়া হয়। বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পে অধিকাংশ নারী শ্রমিক থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ সীমিত বলে উল্লেখ করা হয়।

অতিমাত্রায় বাণিজ্যিকীকরণ ও গোষ্ঠীস্বার্থের কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে শিশুর শিক্ষা ও বিকাশ

এ বিষয়ে বক্তারা বলেন, শিশুদের গুণগত শিক্ষা ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো অনেক স্কুল হচ্ছে, কিন্তু সেগুলোর ওপর কোনো নজরদারি নেই। এই নজরদারি না থাকার কারণে স্কুলগুলোয় গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে না। এগুলো একপ্রকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। সরকারি-বেসরকারি উভয় ধরনের স্কুলে ভর্তিবাণিজ্য হচ্ছে। এ বাণিজ্যের সঙ্গে কেবল স্কুলের শিক্ষকরাই জড়িত নন, বরং এখানে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তির কারণে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিতে এমন ব্যক্তি ঢুকে যাচ্ছেন, যাদের শিক্ষা সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নেই। ফলে তারা সবকিছুকেই নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন। তাদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিতর্ক, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মতো নানা ধরনের সহশিক্ষা কার্যক্রমও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এমনকি বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির অভিভাবক প্রতিনিধি বা কোনো অভিভাবক যদি বিদ্যালয়ের কোনো অনিয়মের বিষয়ে কথা বলেন, তাহলে পরবর্তী সময়ে ওই শিক্ষার্থীকে টিসি দিয়ে বের করে দেয়া হয়। সে কারণে কোনো অভিভাবক বিদ্যালয়ের অনিয়মের বিষয়ে কোনো কথা বলেন না। নানা অজুহাতে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া হয়। এমনকি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে শিক্ষকের জন্মদিন উদ্‌যাপনের মতো ঘটনাও রয়েছে।

বক্তারা উল্লেখ করেন, বর্তমানে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। এমনকি অনেক উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবারও তাদের সব সন্তানকে শহরের সবচেয়ে ভালো মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত স্কুলে পড়াতে পারছেন না আর্থিক অসংগতির কারণে। এছাড়া শিক্ষকরা বিভিন্ন কোম্পানির গাইড বই পড়তে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গাইড বইয়ের কোম্পানিগুলো শিক্ষকদের অর্থ উপঢৌকন দিয়ে তাদের গাইড বইয়ের প্রচার বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করছে। তাছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেত্রাঘাত করা নিষিদ্ধ হলেও শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন এখনো বন্ধ হয়নি, বরং নানা ধরনের নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়েছে।

এক বক্তা উল্লেখ করেন, কোভিড-পরবর্তী সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। আর ওপরের স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্মার্টফোন আসক্তি ও মাদকাসক্তির হার বেড়ে যাচ্ছে উদ্বেগজনক হারে। এর সঙ্গে রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিও যুক্ত। বক্তারা জানান, যুবসমাজের যে অংশ শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র ও প্রশিক্ষণ কোনো পর্যায়েই নেই, তাদের মধ্যে

মাদকাসক্তি, হতাশাজনিত আত্মহনন ও উগ্রবাদী মতাদর্শে দীক্ষিত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। শিশুদের বিকাশ ও শিক্ষার নানা পর্যায়ে তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার পেছনে পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, নাগরিক সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগের অভাব এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখানে অনেকখানি দায়ী। আর শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের জন্য কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি কোভিডকালে শিক্ষাক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার

বক্তারা উল্লেখ করেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একদিকে মানুষকে অনেককিছুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছে, অন্যদিকে এটি সমাজে নানা ধরনের বিতর্ক ও অস্থিরতা সৃষ্টির প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে যার নিজের মতো মন্তব্য করায় সেখানে নানা ধরনের বিতর্কের উদ্ভব হয় এবং এই বিতর্ক অনেক সময় শত্রুতার পর্যায়েও গিয়ে পৌঁছে। আবার যারা উগ্রবাদ ছড়াতে চায়, তারা খুব সহজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কাজে লাগিয়ে অনেককে এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলতে পারে। এসব সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের গুরুত্বের কথা অনেক বক্তার বক্তব্যে উঠে আসে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রসূতি সেবা এখনো সদূর পরাহত

এ বিষয়ে বক্তারা বলেন, পাকিস্তান আমলে বা ২৫ বছর আগে দেশে স্বাস্থ্য খাতের যে দুরবস্থা ছিল, তা থেকে এখন অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন অগ্রসর হয়নি। গ্রামপর্যায়ে পর্যন্ত স্বাস্থ্য খাতের নানা অবকাঠামো তৈরি হলেও সেসব অবকাঠামোয় যাদের সেবা দেওয়ার কথা (চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী), তারা সেখানে যেতে চান না। চিকিৎসক ও সেবাদানকারীর সংকট থাকায় গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোয় সপ্তাহে দু-এক দিনের বেশি চিকিৎসক পাওয়া যায় না। এছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রসূতিসেবা এখনো মানসম্মত পর্যায়ে পৌঁছেনি। বিশেষ করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গভীর রাতে যদি কোনো প্রসূতি রোগী আসে, তাহলে তার চিকিৎসার জন্য উপযুক্তসংখ্যক সেবাদানকারী সেখানে থাকে না। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ২৪ ঘণ্টা প্রসূতিসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। আর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সার্বক্ষণিকভাবে চিকিৎসক ও সেবাদানকারী থাকলেও সবসময় তা কার্যকর নাও হতে পারে। ফলে রাত-বিরাতে যাদের জরুরি ভিত্তিতে সি-সেকশন সেবা প্রয়োজন হয়, তারা নানা সমস্যায় পড়েন। এক্ষেত্রে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে আরও বেশি শক্তিশালী করে কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে তার সঙ্গে ভালোভাবে সংযুক্ত করতে হবে। আর চিকিৎসকদের নিজ কর্ম এলাকায় অবস্থানের জন্য সরকারের নির্দেশনা থাকলেও তা কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। না থাকার অন্যতম কারণ হলো চিকিৎসকদের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি।

সমন্বয়হীনতার কারণে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না অবকাঠামো প্রকল্প

অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের আন্তরিকতার ঘাটতি নেই এবং দেশে বিপুল সংখ্যায় অবকাঠামোর উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু অবকাঠামোগুলোর উন্নয়ন কাজের গুণগত মান বজায় রাখা হচ্ছে না। কারণ বাস্তবায়নের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা দেশের সার্বিক কল্যাণের তুলনায় ব্যক্তিগত স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটাতে প্রকল্প ব্যয় বাড়ানো হয়। আবার যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায়, তাদের সেগুলো বাস্তবায়নের সক্ষমতা থাকে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা টেন্ডার পায়, তারা সাবকন্ট্রাক্ট দিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করায়। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়ক্ষেপণ হয় এবং প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে নাগরিক ভোগান্তি তো আছেই। একইসাথে কাজের গুণগত মান খারাপ হয়।

জলজটের বেড়াজালে

বক্তারা বলেন, চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা একটি বড় সমস্যা। এখানে দুই ধরনের জলাবদ্ধতা হয়। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে নগরীর বিভিন্ন অঞ্চল তলিয়ে যাওয়া; এবং জোয়ারের পানি ঢুকলে তা আর নামতে চায় না। এ বিষয়টিকে এখন বলা হচ্ছে জলজট। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত চট্টগ্রামের জলজট নিরসনে এক লাখ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা একের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনেছেন। জলাবদ্ধতা নিরসনে নাগরিক সমাজ থেকে দাবি তোলা হলে হয়তো একটি প্রকল্প আসে, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। এর অন্যতম কারণ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট আবহমানকাল ধরে চলমান খালগুলো একটি একটি করে ভরাট হয়ে যাওয়া। পানি নিষ্কাশনের জন্য একসময় নগরীতে ৫৭টি খাল ছিল, এখন তা ৩৬টিতে নেমে এসেছে। আর জলাবদ্ধতার জন্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) ও সিটি করপোরেশন একে অন্যকে পাল্টাপাল্টি দোষারোপ করে চলেছে। একই ধরনের প্রকল্প দুই সংস্থাই বাস্তবায়ন করে এবং তাদের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। ফলে প্রতিষ্ঠান দুটির রেষারেষির কারণে জলাবদ্ধতা নিরসনে ফলপ্রসূ কোনো কাজ হচ্ছে না।

জলাবদ্ধতা নিরসনে নিয়মিত কর্ণফুলী নদী ড্রেজিংয়ের তাগিদ

জলাবদ্ধতা নিরসনের বিষয়ে আরেক বক্তা উল্লেখ করেন, পাকিস্তান শাসনামলে কর্ণফুলী নদীতে নিয়মিতভাবে ড্রেজিং করা হতো। এতে করে নদীর নাব্যতা ঠিক থাকত এবং শহরের পানি সঠিকভাবে পরিবাহিত হতো। কিন্তু যখন থেকে কর্ণফুলীর ড্রেজিং বন্ধ হয়ে গেছে, ঠিক তখন থেকেই নগরীতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। বক্তারা উল্লেখ করেন, ওয়াসার প্রকল্প বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, তা তদারকির জন্য একটি নাগরিক কমিটি আছে। সরকারি বিধানমতে, ওই নাগরিক কমিটির প্রধান হবেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যে রাজনৈতিক ব্যক্তি ওই কমিটির প্রধান হচ্ছেন, তিনি একাধারে ওয়াসার ঠিকাদারও বটে। তাহলে সেখানে নাগরিকদের কণ্ঠস্বর কতটা প্রতিফলিত হবে, সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

সব ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হবে

সবশেষে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ এসডিজি অর্জনে ভালো সাফল্য দেখালেও; এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বেশ বেগ পেতে হবে। টেকসইভাবে যদি কোনো উন্নয়ন করতে হয়, তাহলে সেজন্য একটি প্রস্তুতি, হোমওয়ার্ক ও দূরদর্শী পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে জাতিগতভাবেই আমরা কিছুটা দুর্বল এবং আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো আরও বেশি দুর্বল। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আমাদের সংবিধানকেও টেকসই করতে পারিনি। আমরা কেবল পিছু হটেছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, শিশুদের সামগ্রিক শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয়ে কী কী সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন, তা আগে থেকেই আমাদের জানা ছিল। কিন্তু আমরা বিদ্যালয়গুলোয় সেসব সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা করিনি। শিশুদের নানামুখী প্রতিভা বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ, ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা ও অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। স্কুলে বর্তমানে শিক্ষা কার্যক্রম কেবল পরীক্ষা নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষার্থীদের বর্তমানে পরীক্ষায় পাস করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করানো হচ্ছে মাত্র। এতে করে তারা বর্তমানে খন্ডিত শিক্ষা নিয়ে গড়ে উঠছে। অথচ এসডিজির অন্যতম অভীষ্ট মানসম্মত শিক্ষা।

বক্তারা উল্লেখ করেন, বিভাগীয় কমিশনার থেকে শুরু করে থানার ওসি পর্যন্ত কোনো সরকারি কর্মকর্তা তাদের পরিবার নিয়ে কর্মস্থলে থাকেন না, সবাই ঢাকাকেন্দ্রিক। ফলে পুরো দেশটা 'ওয়ান সিটি কান্ট্রি' হয়ে গেছে।

এমনকি পাকিস্তান আমলেও এত এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা ছিল না। অনেক প্রতিষ্ঠানের হেডকোয়ার্টার্স প্রয়োজন অনুসারে চট্টগ্রামে ছিল। এমনকি ব্রিটিশ আমলেও এসডিওরা পরিবার নিয়ে কর্মস্থলে নিজের বাংলোয় অবস্থান করতেন। এর ফলে তাকে কেন্দ্র করে ওই শহরে একটি সাংস্কৃতিক বলয় ও সুধী সমাজ গড়ে উঠত। মূলত দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে মানুষের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা সামগ্রিক আকাঙ্খার তুলনায় বেশি প্রাধান্য পাওয়ায় আজকের এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয় হয়েছে। এর পাশাপাশি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা একাডেমি ও এশিয়াটিক সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলোয় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও গবেষণা কার্যক্রম অনেক সীমিত হয়ে পড়েছে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান সমাজের উন্নয়নে আগের মতো সক্রিয় অবদান রাখতে পারছে না। আর আমরা যেটিকে নাগরিক সমাজ বলি, সেটি আসলে আত্মীয় সমাজে রূপ নিয়েছে। আমরা সমাজের সামগ্রিকতার চেয়ে আত্মীয়তার বন্ধন খুঁজে খুঁজে চলার বিষয়ে বেশি আগ্রহী। এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়নি। ফলে নাগরিক সেবাগুলো ঠিকমতো পাওয়া যায় না। সমাজে দুর্নীতি দূর করতে হলে আগে বৈষম্য দূর করতে হবে।

সমাপনী বক্তব্যে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশ ষাটের দশকে একটি স্বর্ণযুগ পার করেছে। এরপর নব্বইয়ের দশকে গণতন্ত্রে উত্তরণের পর কিছুটা হলেও দেশে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ বর্তমানে একটি সংকটকাল পার করছে। গত ১০ বছরে দেশের যে উন্নয়ন-অগ্রগতি হয়েছে, তা টেকসই করার জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাতে আমরা অদূর ভবিষ্যতে আবার বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঢুকে যেতে পারি। এটিই ভয়ের জায়গা। সবাই মিলে এটিকে প্রতিহত করতে হবে, অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। এসডিজির মূল দর্শন এটাই। সবশেষে তিনি উপস্থিত অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: মো. মাসুম বিল্লাহ

সিরিজ সম্পাদনায়: অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

সহযোগী সম্পাদক: অভ্র ভট্টাচার্য

আয়োজক

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সহযোগিতায়

GHASHFUL

সহযোগী প্রতিষ্ঠান

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE
HEKS EPER Bread for all.
Manusher Jonno Foundation
TRANSPARENCY INTERNATIONAL BANGLADESH Social movement against corruption
WaterAid
UNDP

www.bdplatform4sdgs.net
BDPlatform4SDGs
Citizen'sPlatformforSDGsBangladesh
BDPlatform4SDGs

নভেম্বর ২০২২

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা

ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net